The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 14, No. 27-28, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

সাহিত্যের ভাষা: রবীন্দ্রভাবনার স্বরূপ সন্ধান

মোঃ মাইনুল ইসলাম*

Abstract: It is a human instinct to express one's exclusive feelings as the responses of different stimuli and make them perceptible to others'. This applies even more to authors, artists and sculptors. They express their thoughts through verses, paints, and statues respectively. The subject of our discussion is the language of literature. When the language of mind is presented through the language of description, it becomes harder to express properly. Because one's feeling is not expressible in the language of description or statement as this language only describes and conveys information or messages. Esoteric thoughts of a person cannot be similarly spread in the minds of others. So the language of literature should be different from the language of description. The Language of literature demands the use of different mechanisms and literary tools to make it more connecting and expressive. Rabindranath Tagore discussed the nature of the language of literature in his different writings. The present article will attempt to find out the nature of Tagore's thoughts of/ about the language of literature.

চাবিশব্দ: ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, ছন্দ, অনুপ্রাস, ঋণকরণ, পদক্রম, যতি, উপমা, চিত্রকল্প।

মানুষ অন্য প্রাণী থেকে স্বকীয়তার যে গৌরব করতে পারে, তার প্রধান কারণ তার মন। সীমাহীন চিন্তা ও সৃজনক্ষমতা, অভিলাষ ও কাঙ্ক্ষার আবেদন, অনুরাগের আবেশ ও ক্রোধের উন্মত্ততা, উপভোগ ও অনুভবের বিচিত্র রং মানবমনের অনন্য বৃত্তি। 'যে মন মানুষের অনন্যসুলভ সম্পদ, সেই মনের ত্রিধা বৃত্তি– চিন্তা (thinking), সঙ্কল্প (willing), অনুভব (feeling)। মনের এই ত্রিধা বৃত্তির প্রকাশ ঘটে ত্রিবিধ ক্রিয়ায়– জ্ঞানান্বেষণ, কর্মসাধনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি' (শ', ১৯৯৬: পৃ. ২)। আনন্দ-হতাশা-দুঃখ, স্নেহ-মমতা-ভক্তি-প্রেম, চিরকালীন সৌন্দর্য সৃষ্টির বাসনা কিংবা অতৃপ্তি, সৃজনবাসনা প্রভৃতি মানবমনকে চির-অভেদ্য রহস্যময়তায় কখনো আচ্ছন্ন করে, কখনো উচ্ছ্বসিত করে। এই আবেগ, অনুভূতি বা রহস্যময়তাকে শিল্পিত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বাইরে নিয়ে আসা এবং অপরাপর মানুষের হৃদয়লোকে সঞ্চারিত করতে চাওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি বা রহস্যময়তাকে মূর্তি দেয় ছয়টি প্রধান

* প্রভাষক, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

শিল্পের মাধ্যমে: ১. সাহিত্য, ২. সংগীত, ৩. চিত্র, ৪. নৃত্য, ৫. স্থাপত্য ও ৬. ভাস্কর্য। রং ও রেখার মাধ্যমে যেমন চিত্র প্রকাশিত হয়, বিশেষ অবয়ব নির্মাণের মধ্য দিয়ে ভাস্কর্য নির্মিত হয়, সুর ও কথার সাহায্যে সংগীত ŵতরি হয়, তেমনি সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম ভাষা। চার্লস হকেটের মতে– 'Literature is an art-form, like painting, sculpture, music, drama, and the dance. Literature is distinguished from other art-form by the medium in which it works: Language. (Hockett, 1968: 553)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম হিসেবে যে ভাষার কথা বলেছেন, তা একদিকে যেমন কাঠামোগত বভিন্ন্যে বিশেষ, অন্যদিকে তা ব্যঞ্জনাময়। নিছক তথ্য বা সংবাদ জ্ঞাপক ভাষা নয়, কাঠামো ও ব্যঞ্জনাময়তায় ভাষারূপটি এমন হবে যাতে মহাকালের যাত্রায় যুগান্তরের হৃদয়ে লেখকের হৃদয়ের ভাব সঞ্চারিত করে দেওয়া সম্ভবপর হয়। ধ্বনি, শব্দ বা পদ, বাক্যরীতি, উপমা ও চিত্রকল্প প্রভৃতির সংগতিময় উপস্থিতি ভাষার প্রকাশকে নির্বিশেষ থেকে বিশেষে উন্নীত করে কীভাবে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার স্বরূপ অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রবন্ধের মূল আলোচনা তৈরিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন রচনা থেকে সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে তার ভাবনাজ্ঞাপক উক্তি এবং সৃজনশীল রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২. ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা

'ভাষা' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় '√ভাষ্' ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'ভাষ' শব্দের আভিধানিক অর্থ উক্তি, বাক্য ইত্যাদি। অন্যদিকে 'ল্যাঙ্গুয়েজ' শব্দটি যে ল্যাটিন 'লিঙ্গুয়া' থেকে বিবর্তন লাভ করেছে, তার অর্থ জিহ্বা। ব্যুৎপত্তি বিচারে উভয় শব্দের অর্থই উচ্চারণ বা বলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (ফরাসি, চীনা, আরবি, রুশ, হিস্পানি প্রভৃতি ভাষার 'ভাষা'বাচক শব্দ থেকেও একই ধারণা পাওয়া যায়)। তাই এ কথা বলা যায় যে, ভাষা মানুষের চিন্তার ধ্বনিময় প্রকাশ। তবে ভাষার আধুনিক সংজ্ঞায়নে আবশ্যকভাবে পরিবর্তন এসেছে। জাতিসংঘের 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ' (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'ভাষা' বলতে যেমন উচ্চারণ ও চিহ্ননির্ভর ভাষাকে বুঝাবে, তেমনি অন্যান্য নিঃশব্দ ভাষাকেও বুঝাবে ("Language" includes spoken and signed languages and other forms of non spoken languages', CRPD, article-2)। ভাষার রূপ যা-ই হোক না কেন, এর কাজ ব্যক্তির বক্তব্যকে শ্রোতা বা পাঠকের বোধগম্য করে পারস্পরিক ভাববিনিময় সম্পন্ন করা। এই ভাববিনিময়ের দুটি লক্ষ্য আছে: ১. তথ্য, বার্তা বা বিবৃতি প্রকাশ বা অবগতকরণ। ২. বক্তা বা লেখকের মনোলোকের বিচিত্র অনুভূতিকে অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা। দুটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক:

১. '... হংকং বন্দরের পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে, তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরনা ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে, ঐদত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে ভিজে মাথা জলের উপর তুলেছে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরছে।' (ঠাকুর, ১৯৮৯: ৪১৬ [জাপান-যাত্রী, পত্রসংখ্যা: ১১])

২. ... হংকং বন্দরের সুউচ্চ পাহাড় ও ঝরনাগুলো চোখে পড়ছে।

প্রথম দৃষ্টান্তটি লেখকের অন্তরলোকের অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ, যা অপরের হৃদয়কে লেখকের ন্যায় অভিভূত করতে পারে। বাক্যটি পাঠ করলে দৃশ্যটি পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত প্রথম ছবিটির তথ্য দেয় মাত্র, বাক্যটিতে বক্তার ভাবকে অনুভবযোগ্য করে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। এই দ্বিবিধ ভাষারূপের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির শিল্পিত প্রকাশ ঘটাতে চাইলে ভাষাব্যবহারে বিশেষ প্রস্তুতি দরকার। আর এ কারণেই নৈমিত্তিক প্রয়োজনের ভাষার চেয়ে সাহিত্যের ভাষা আলাদা মেজাজের হয়ে থাকে। কারণ, এতে মনের ভাষাকে প্রাকৃতিক ভাষায় অনুবাদ করে বোধগম্য ও অনুভবযোগ্য করে তোলা হয়। এভাবেই ব্যক্তির ভাব ও ভাষা স্থান ও কালগত সীমা পেরিয়ে চিরকালীনতা লাভ করে।

সাহিত্যে ভাষাকে সন্ধি করতে হয় লেখক বা শিল্পীর আত্মার সঙ্গে। একারণেই সাহিত্যের ভাষার সংজ্ঞায়নে ভাষা ও আত্মার সম্পর্কই মুখ্য। এ প্রসঙ্গে জার্মান মনীষী হুমবোল্টের উক্তি স্মরণ করা যায়– মানুষের ভাষাই হলো তার আত্মা, আর তার আত্মাই হল তার ভাষা– 'Ihre Sprache ist ihr Geist/ und ihr Geist ihre Sprache' (উদ্ধৃত: শ', ১৯৯৬: পৃ. ২)। তবে মন, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সম্পর্কের কথা এলে ভাষার আরও দুটি রূপের কথা বলতে হয়: ১. মনের ভাষা এবং ২. প্রাকৃতিক ভাষা বা বাহ্য ভাষা। মনের ভাষাকে চিন্তা কিংবা আত্মকথনও বলা যায়। কোনো উদ্দীপনার প্রভাবে মনোলোকে যে আলাপ শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ক্রমশ ব্যাপ্ত হয়, তাকে মনের ভাষা বা চিন্তা বলা যায়। এই চিন্তাকে আমরা যে ভাষায় প্রকাশ করি, তাকে বলা যায় প্রাকৃতিক বা বাহ্য ভাষা। এ প্রসঙ্গে প্লেটোর উক্তি স্মরণ করা যায়, 'চিন্তা ও ভাষা মূলত একই; পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, চিন্তা হলো আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন, আর যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে তা-ই হল ভাষা (উদ্ধৃত: শ, ১৯৯৬: পৃ. ২)। ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্য দিয়ে বয়ে আসা ভাষা কিংবা সংকেতরাজির বিন্যাসে প্রকাশিত ভাষা– উভয়ই প্রাথমিক ভাবে বর্ণনার ভাষা। এই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপ দিতে না পারলে কোনো কিছু জ্ঞাপন করা গেলেও উদ্‌বোধন সম্ভবপর হয় না। একের হৃদয়কে অপরের হৃদয়ে স্থাপন করতে, একের অনুভব অপরের মনে সঞ্চারিত করতে সাহিত্যিক তার প্রকাশমাধ্যমকে নানা কলার আশ্রয়ে ব্যঞ্জনাসম্ভব করে তোলেন।

ভাষাকে সাহিত্য প্রকাশের উপযোগী করে তুলতে এর প্রায় সকল উপাদানের বিশেষায়িত ভূমিকা প্রয়োজন। ভাষার ধ্বনি সাংগঠনিক বিচারে ক্ষুদ্র হলেও, তা অর্থের চেয়েও দ্রুত ও কার্যকরভাবে হৃদয়কে আলোড়িত করে। ধ্বনির প্রকাশ দেখা যায় ছন্দে; সুর, শ্বাসাঘাত প্রভৃতিতে; অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দালংকারে। শব্দ ও পদ ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করে তোলার আরেকটি ক্ষেত্র। বিশেষ শব্দ নির্বাচন ও পদগঠনের মধ্য দিয়ে ভাষার শক্তি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। বাক্যরীতির অনুসৃতি বক্তব্যের ভাব প্রক্ষেপণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই, লেখকমাত্রই বাক্যরীতি-সচেতন। রচনায় উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ ও পরিস্থিতিকে বাস্তবসম্মত করে তুলতে অনবদ্য ভূমিকা রাখে। উল্লেখকৃত বিষয়গুলোর পরিচর্যা ও পরিবেশনা ভাষার প্রকাশক্ষমতাকে পাঠকের বোধগম্যতার অনুকূল করে সার্থক সাহিত্যের ভাষা নির্মাণে সাহায্য করে।

৩. রবীন্দ্রভাবনায় সাহিত্যের ভাষা

তথ্যজ্ঞাপন, আত্মপ্রকাশ, কল্পনা বা চিন্তার প্রকাশ, শিল্পসৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদনের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। কখনো একটি শব্দ, বাক্য বা পরিসংখ্যানের সাহায্যে উদ্দিষ্ট তথ্যজ্ঞাপনের কাজ সম্পাদিত হয়, কখনো উপমা-অলংকার প্রভৃতির প্রয়োগে উপস্থাপিত ভাষিক কাঠামো ব্যক্তির হৃদয়ের দর্পণ হয়ে পাঠক-শ্রোতাকে বক্তা, লেখক বা শিল্পীর হৃদয়লোকের অনুভবে আবিষ্ট করে। ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক—

১. ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা। (ঠাকুর, ২০০০: ৩৬১)

২. চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। (ঠাকুর, ১৯৮৯, নবম খণ্ড: ৬২৬)

৩. ...ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে। (ঠাকুর, ১৯৮৯, ত্রয়োদশ খণ্ড: ৫৮৩)

৪. মানুষের ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। (ঠাকুর, ১৯৮৯, ত্রয়োদশ খণ্ড: ৬৬১)

৫. জানার কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোধে জাগানো, এ ছাড়া ভাষার আর-একটা খুব বড়ো কাজ আছে। সে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া। এক দিকে এইটেই সবচেয়ে অদরকারি কাজ, আর-এক দিকে এইটেতেই মানুষের সবচেয়ে আনন্দ। (ঠাকুর, ১৯৮৯, ত্রয়োদশ খণ্ড: ৫৭৭)

উদ্ধৃতিগুলোতে ক্রিয়াগত দিক বিবেচনায় ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। প্রথম উদ্ধৃতিতে ভাষা একটি পথ, যে পথে মানুষের ভাব বা চিন্তার গমনাগমন চলে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে ভাষা একটি বাহন, যা ব্যক্তির চিন্তাকে ধারণ করে বা বহন করে পৌঁছে দেয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে। তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্ধৃতিতে ভাষাকে আত্মপ্রকাশের

মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম উদ্ধৃতিতে একটু আলাদা ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায়– ভাষা মানুষের কল্পনাকে রূপদান করে। অর্থাৎ মানুষের হৃদয়লোকের ভাষাকে ব্যক্ত করে। ভাব বা চিন্তার প্রকাশ এবং কল্পনাকে রূপদান– এর মধ্যে প্রথমটির প্রয়োজন এড়ানো একরকম অসম্ভব। দ্বিতীয়টির প্রয়োজন রসের, বলা যায় রসিকের দাবি। এখানেই মানুষের স্বাতন্ত্র্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। এই দ্বিবিধ কাজ সম্পাদনে ভাষার প্রকাশরূপও আলাদা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লৌকিক উপমায় বিভাজনটি তুলে ধরেছেন এভাবে–

> উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল-ফলাতে ক্ষণে জন্মায় ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্র রূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার। ... ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের কাজ সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়; ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদবহনে তার সমাপ্তি। আর-একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে ŵদনিক আশুপ্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল তমালের মতো; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বের চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে এ'কেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য। (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮২)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষার যে প্রকাশরূপকে সাহিত্যের বাহন হওয়ার কথা বলেছেন, তা হবে 'শাল তমালের মতো', যা মহাকালের সুব্যাপ্ত কালখণ্ডে 'বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বের চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে'। অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষার যে প্রকাশরূপ থাকবে, তার আয়োজনে থাকবে অলংকার, উপমা, শব্দ-বাক্যের অনন্য বিন্যাস এবং অর্থ ও ব্যঞ্জনার যথার্থ উপস্থাপন। সাধারণ বিবৃতি প্রকাশের ভাষার সঙ্গে এর বিস্তর পার্থক্য থাকবে এ কথা বলা বাহুল্য।

সাহিত্যের ভাষা কোনো কিছুকে নিছক প্রকাশ করে তা নয়, এই প্রকাশেও যথাসম্ভব উৎকর্ষ সাধন করে। ব্যক্তির মনোলোকে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যে নতুন ভাবজগৎ তৈরি হয়, মানুষ তাকে বিশ্বজনীন করে রেখে দিতে চায়। মানুষের এই চাওয়াকে সুসংহত রূপ দিতে ভাষার প্রকাশরূপে নানাবিধ ভাষিক কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে–

> ... ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল। তার খুশি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল; তাতে সে আশু উদ্‌বেগের প্রবর্তনা ছাড়িয়ে গেল, তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে সুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ। আর আপন ভালোমন্দলাগার জগৎকে অন্তরঙ্গ ভাবে সকল মানুষের সাহিত্যজগৎ করে নিলে। (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮২)

সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রনাথ নৈকট্য বা সম্মিলনকে বোঝেন। প্রয়োজনের বাঁধা নিয়মে যে মিলন, তার সীমা পেরিয়ে যে নৈকট্য বা মিলনের তাড়না মানুষ অনুভব করে, তা-ই সাহিত্যের কাজ। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে শাকসবজি ও ফুলের বাগানের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, শাকসবজির সঙ্গে ভোজ্য বিষয়ের যোগ, অন্যদিকে ফুলের বাগানের সঙ্গে মানুষের মন মিলতে চায়। সাহিত্যের অর্থ যদি নৈকট্য বা মিলন হয়, তবে সাহিত্যের ভাষার কাজ মিলন ঘটানো– 'তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, সেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য' (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮২)। মানবভাষা এভাবেই সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজনের এই বাধাহীনতা ব্যক্তির চৈতন্যকে যেমন মুক্ত করে, তেমনি মুক্তির প্রকাশ ঘটে তা প্রকাশের ভাষায়।

যেখানেই মানুষের প্রয়োজন নিষ্কাম, সেখানেই বাহুল্য জায়গা করে নেয়, সেখানেই সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। এইজন্য মানুষের নিত্যপ্রয়োজনের ঘর হেঁশেলের চেয়ে, বসার ঘরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয় বিপুল আয়োজনে। মানুষ এই বসার ঘরের সাজসজ্জার সাহায্যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সাধারণ প্রয়োজনের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে বিভেদটি অনুরূপ। ছড়া, কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্য প্রকাশের ভাষার সংগঠন ও ব্যঞ্জনা লক্ষ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানুষের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য সে '...কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক' (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮৪)। মানুষ তার বস্তুজগৎ ও কল্পনার জগৎ সর্বত্রই নিজের মনের রং লাগাতে থাকে। এর ফলে অপরাপর বিষয়-বস্তুকে সে নিজের করে নেয়। ফলত, ব্যক্তির ভাবলোকে সৃষ্ট জগৎ বাহ্যজগতের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, '... মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই' (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮৫)। এভাবে নিজের করে নেওয়া জগৎটি ব্যক্তির হৃদয়লোকের রসে জারিত হয়ে যে অনুভবের দ্যোতনা করে, মানুষ তা রক্ষা করতে চায় ধ্বনি-লিপি সহযোগে। তবে কেবল তথ্যজ্ঞাপক কিংবা বর্ণনার ভাষায় সেই অনুভবের দ্যোতনাকে প্রকাশ করা যায় না, তখন মানুষ আশ্রয় নেয় বিশেষ ভাষাভঙ্গির–

> বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে, সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা রসের অনুভূতি প্রবল হলে তা ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা ক'রে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮৫)

ভাষার শারীর প্রকাশে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যই মুখ্য। এর বাইরে আর যে বিষয়টি থেকে গেল, তা হলো অর্থ। ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যকে বলতে পারি দ্যোতক, আর অর্থ বা উদ্দীপনাসূত্রে সৃষ্ট ভাব হলো দ্যোতিত। সাহিত্যের ভাষারূপ যেহেতু সেই ভাবলোককেই প্রকাশ করে, তাই পর্যায়ক্রমে সাহিত্যের ভাষার প্রকাশরূপের আলোচনা করা যাক :

৩.১ ভাষার ধ্বনি

ধ্বনি ভাষার ক্ষুদ্রতম সাংগঠনিক একক। এক বা একাধিক ধ্বনির যৌক্তিক সমবায়ে গঠিত হয় শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন– 'অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে ...' (ঠাকুর, ১৯৮৯, ত্রয়োদশ খণ্ড: ৬০২)। ধ্বনির আর্থ প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত হয়ে ওঠে একটি ভাষাগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের ভাষিক চর্চার মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে সে জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তাই বিশেষ ধ্বনিশৈলী শ্রোতা-পাঠকের মনে বিশেষ ধরনের অনুভূতির অভিজ্ঞতা তৈরি করে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, লেখ্য ভাষার যে সীমাবদ্ধতা তা লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রচনায় যেখানে শব্দে বিশেষ ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়, সেখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত টীকা, বর্ণনা, ইঙ্গিত বা নির্দিষ্ট যতিচিহ্নের প্রয়োগ দেখিয়ে কাঙ্ক্ষিত অর্থ স্পষ্ট করা হয়। রসসাহিত্যে ধ্বনির অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন– 'নিত্যব্যবহারের ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মজাল দিয়ে বাঁধতে হয়। রসপ্রকাশের ভাষাকে বাঁধতে হয় ধ্বনিসংগতের নিয়মে' (ঠাকুর, ১৯৮৯, একাদশ খণ্ড: ৫৭৬)। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন– রসসাহিত্য মুখ্যত জ্ঞানের জিনিস নয়, তা মর্মের অধিগম্য। তাই, সেখানে কেবল অর্থ যথেষ্ট নয়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন; কেননা ধ্বনি বেগবান্। ছন্দের বন্ধনে এই ধ্বনিবেগ পায় বিশিষ্টতা, পায় প্রবলতা' (ঠাকুর, ১৯৮৯, একাদশ খণ্ড: ৫৭৬)। তবে একই রচনার ধ্বনিগত প্রভাব ভাষীভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ, ভাষাব্যবহারকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভাষার ধ্বনিব্যবস্থা নিয়ে একধরনের অভিজ্ঞতা তৈরি হওয়ায়, ভাষায় সেই ধ্বনিরূপের প্রয়োগ যে বিশেষ ভাব বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, অন্য ভাষার ব্যবহারকারীদের নিকট অনুরূপ করে না।

ভাষার ধ্বনিময়তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কবিতায়। সাংগঠনিক বিচারে কবিতার প্রাথমিক কিংবা চূড়ান্ত পরিচয় একটি ভাষাময় শরীর হিসেবে। যার প্রধান গাঠনিক উপাদান হলো ধ্বনি। যদিও কবিতা হলো– শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের লীলা, তার পরেও কবিতায়, উচ্চারিত ধ্বনির আবেদনই প্রথম (খাতুন, ২০০৯: ২৫)। কবিতার উদ্দিষ্ট ভাব বা যথাযথ অভিব্যক্তি প্রকাশের লক্ষ্যে একজন কবি তাঁর কবিতাকে উপযুক্ত ধ্বনির অলংকারে সজ্জিত করেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ধ্বনির সকল প্রয়োগই কবির বিশেষ পরিকল্পনা সাপেক্ষে স্বেচ্ছা-নির্ধারিত নয়। কখনো তা কেবল কাব্যভাব প্রকাশের নিরাসক্ত বাঙ্ময় স্রোতের অনিবার্য ফল।

সাহিত্যের ভাষার ধ্বনির প্রসঙ্গ এলে বোধ করি সবার আগে ছন্দের আলোচনা চলে আসে। গদ্য-পদ্যের ভাষায় যে নানাবিধ ছন্দ ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে ভাবের বিস্তর যোগ রয়েছে। একেকরকম ছন্দ একেকরকম ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কাব্য ও ছন্দ' প্রবন্ধে বলেন– 'ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে– এ

কথা স্বীকার করতে হবে' (ঠাকুর, ১৯৮৯: ১৮৮)। এছাড়া যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালংকার সাহিত্যের ভাষায় সংগতিময় ধ্বনিবিন্যাসের মাধ্যমে রচনার শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করে। উদাহরণ হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম-এর 'বিদ্রোহী' কবিতার অনুপ্রাস প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত নিচের টেবিলে দেওয়া হলো:

অন্ত্যানুপ্রাস	বৃত্ত্যনুপ্রাস	ছেকানুপ্রাস	শ্রুত্যনুপ্রাস
বীর-শির-হিমাদ্রির-বীর, ফাড়ি-ছাড়ি, ভেদিয়া-ছেদিয়া, বিধাত্রীর-জয়শ্রীর, নৃশংস-ধ্বংস, দুর্বার-চুরমার, উচ্ছৃঙ্খল-শৃঙ্খল, আইন-মাইন, বৈশাখীর-বিধাত্রীর, ঘূর্ণি-চূর্ণি, ছন্দ-জীবনানন্দ, ছমকি-চমকি, মন যা-পঞ্জা-ঝন্‌ঝা, ধরিত্রীর-অধীর, শ্মশান-নিশাবসান, সূর্য-তূর্য, বারিধির-গঙ্গোত্রীর, চেঙ্গিস-কুর্নিশ	শির-শিখর, ভীম-ভাসমান, চল-চঞ্চল, চকিতে-চমকি, চপলা-চপল, দুরন্ত-দুর্মদ, দাবানল-দাহ-দহন, , জল-ছল-ছল, উন্মন-উদাসীর, উন্মন-মন, বিধবার-বুকে, শ্বাস-হুতাশ, হা-হুতাশ, বঞ্চিত-ব্যথা, চিত-চুম্বন-চোর, প্রথম-পরশ, চকিত-চাহনি, কাঁকন-কনকন্, অচেতন-চিতে-চেতন	উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল (জ্ব), রাজ-রাজটীকা (রাজ), চিরদুর্দম-দুর্বিনীত (দুর্), ভরা-তরি - ভরা-ডুবি (ভরা), ঠমকি-ছমকি (কি), শাসন-ত্রাসন (সন্), দুর্দম-হর্দম (-র্দম), সাগ্নিক-জমদগ্নি (গ্নি), অবসান-নিশাবসান (-বসান), প্রণব-প্রচণ্ড (প্র), প্রশান্ত-অশান্ত (শান্ত), অরুণ-তরুণ (রুণ), রৌদ্র-রুদ্র (দ্র), নির্ঝর-ঝর-ঝর (ঝর), অচেতন-চেতন (চেতন),	পাতালে-মাতাল ('প' ও 'ম'), মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি ('ম', 'ব' ও 'ফ'), চল চঞ্চল ঠমকি ছমকি ('চ' ও 'ছ'), পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া ('ক', 'গ'),

টেবিল: 'বিদ্রোহী' কবিতার অনুপ্রাস বিশ্লেষণ

২. শব্দ ও পদ

দার্শনিক Ludwig Feuerbach বলেন– The word makes men free. Whoever cannot express himself is a slave. Speaking is an act of freedom; the word is freedom itself (Quoted: Mario Pei, 1957: 111). অর্থাৎ শব্দ মানুষকে মুক্তি দেয়। যে মনের কথা বলতে পারে না, সে ক্রীতদাস। ভাষার শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত হলে তার নাম হয় পদ। শব্দ থাকে অভিধানে আর মস্তিষ্কে (মানসিক অভিধান)। সাহিত্যে বিষয় অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করা হয়। কখনো বিশেষ শব্দরূপ নির্বাচন, ব্যাকরণিক বিচ্যুতি ঘটিয়ে নতুন শব্দরূপ তৈরি, অন্যভাষার শব্দ ঋণকরণ, নতুন শব্দগঠন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্যে রচনার ভাষাকে প্রকাশক্ষম করা হয়। একসময় বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দবহুল সাধুরীতি বহুলভাবে অনুসৃত হতো। তখন

সাধুরীতির ক্রিয়ারূপের বিশেষ গঠন, তৎসম শব্দের বিপুল ব্যবহার প্রভৃতির সাহায্যে রচনার ভাষাকে গুরুগম্ভীর ও ব্যঞ্জনাময় করা হতো। নিচে শব্দ নির্বাচনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

সাধারণ গঠন	**কাব্যিক গঠন**
গাহিতে	গাহিবারে
রত্ন	রতন
মুচকে	মুচকিয়ে
করলাম	করিনু
পালন করলাম	পালিলাম

তবে চলতিরীতির বহুল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে উপর্যুক্ত কাব্যিক প্রকাশেও পরিবর্তন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল অতিক্রান্ত হয়ে ভাষার নতুন যুগ সূচিত হয়েছে বহু বছর ধরে। বর্তমানে সাহিত্যের শব্দ সাধুরীতি-প্রভাবিত নয়, প্রমিত-প্রভাবিত। প্রমিতরীতির ভাষায় কথা বলা ও সাহিত্য রচনা উভয়ই চলে। চলতি রীতিতে অর্থ বা ভাবের প্রয়োজনে তৎসম শব্দের ব্যবহার ভাষাকে পরিপুষ্টি দান করে।

সাহিত্যের ভাষায় শব্দ বা পদগঠন যে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ও দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য: 'মায়ের চোখে দেখা খোকার পায়ে ছোট্টো লাল জুতোকে জুতো বললে তাকে যথার্থ করে বলাই হয় না। মাকে তাই বলতে হল– খোকা যাবে নায়ে,/ লাল জুতুয়া পায়ে। ... অভিধানে কোথাও এ শব্দ নেই' (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮৫)। শিশুকে উদ্দেশ্য করে মা বা তার অভিভাবক-স্বজনরা বিড়ু (বেড়ানো), দুদু (দুধ), ভাতু (ভাত) ইত্যাদি নানা আদরসূচক শব্দ ব্যবহার করে কথা বলেন। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন– 'মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা– তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন' (ঠাকুর, ১৯৮৯, চতুর্থ খণ্ড: ৪৫১)। রসবোধের এই চরমতাকে প্রকাশের জন্য উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় বিশেষ ভাষিক নির্বাচনের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। 'জুতুয়া' শব্দের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে শব্দসমবায় ব্যবহার করেছেন, তাতেও সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে শিশুর প্রতি রসবোধের প্রকাশ ঘটেছে। ছোটো না বলে 'ছোট্ট' বলা এবং জুতা না বলে 'জুতো' বলার মধ্যে একধরনের নির্বাচনধর্মিতা চোখে পড়ে। 'আ' ধ্বনির চেয়ে 'ও' ধ্বনি প্রয়োগে কোমলতার প্রকাশ ঘটা বাংলা ভাষার বহু শব্দের দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায়– 'আ' উচ্চারণে আমরা বদন ব্যাদান করি; মুখকোটরের পরিসর ও বিস্তার যথাশক্তি বাড়াইয়া লই। 'ই' উচ্চারণে মুখকোটরের বিস্তার ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারনে আরও ছোট হয়। আমি বলিতে চাহি যে, ঠিক এই জন্যই law of association অনুসারে 'আ' 'ই' 'উ' এই তিন স্বরের মধ্যে আ বড় বুঝায়; ই তার চেয়ে ছোট, উ আরও ছোট বুঝায়'

(ত্রিবেদী, ১৩১৪: ২)। বিশেষ্যবাচক শব্দের ন্যায় নির্দেশকের ব্যবহারেও এই রসবোধের প্রতিফলন বা নির্বাচনধর্মিতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেন–

> বাংলায় হাসিখানি শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা আদরের ভাষা। আদর করিয়া হাসিকে যেন স্বতন্ত্র একটি বস্তুর মতো করিয়া দেখা যাইতেছে। মনে পড়িতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন ভাবের কথা কোথায় দেখিয়াছি যে, 'তাহার মুখের কথাখানির যদি লাগ পাইতাম'– এখানে আদর করিয়া মুখের কথাটিকে যেন মূর্তি দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবেই 'স্পর্শখানি' বলিয়া থাকি। (ঠাকুর, ২০০০: ৩৭৯)

এই নির্বাচনধর্মিতা থেকেই কখনো কখনো লেখকের মনস্তত্ত্বে জাতবিচারের প্রবণতা তৈরি হতে পারে। ধর্ম, সামাজিক শ্রেণি, রাজনীতি প্রভৃতি সৃষ্ট সমাজভাষাতাত্ত্বিক কারণে ভাষিক উপকরণ নির্বাচনের প্রবণতা বহু পুরোনো ব্যাপার। তবে এসবের বাইরেও লেখককে চারপাশের নানা অনুষঙ্গ ভাষাব্যবহারে প্রভাবিত করতে পারে, যার প্রতিফলন দেখা যায় সাহিত্যের ভাষায়। *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'জাত-মানা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবে:

> সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারালো। বক ফুল, বেগুণের ফুল, কুমড়ো ফুল, এই-সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজনে-মঞ্জরি পরতে দ্বিধা করেন, বক ফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলংকার-মহলে তাদের দ্বার খোলা– কেননা, পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডালনায় লাগত তা হলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হত। তিসি ফুল সর্ষে ফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবিকল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষ ফুলের সঙ্গে গোলাপজাম ফুলের রূপে গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল; কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজনলোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাতবিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি, অমৃতে অনটন ঘটে না বলেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখি ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়; কিন্তু, রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হল। সকল ব্যবহারের অতীত বলেই মকর বেঁচে গেছে– ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হল না,

> নির্বাচনের সময় রুই কাতলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাখনায় জোর কম বলেই এমনটা ঘটেছে তা তো মানতে পারি নে। কেননা, লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন বলে বেছে নিলেন তার দৌর্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি। (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৫২)

লেখক রবীন্দ্রনাথ সামান্য হলেও এই জাতবিচার দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছেন, তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। 'বাঁশ' শব্দটি ব্যবহারে সংকোচ অনুভব করায়, তিনি 'বেণু' ব্যবহার করেছেন। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন– 'আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন ব'লে সামলে নিতে হয়' (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৫২)। কাব্যে এই সংকোচ থাকলেও শিল্পের অন্যান্য শাখা বিশেষ করে চিত্রশিল্পে এর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। কবির কলমে মহিমান্বিত ফুল যেমন শিল্পীর তুলিতে ফুটে ওঠে, তেমনি কাব্যে কম উচ্চারিত ফুল একই তুলিতে অবয়ব পায়। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছে, কচুগাছ কাব্যে স্থান না পেলেও রূপকারের তুলি তাকে আঁকে নিঃসঙ্কোচে।

মানবমনের বিচিত্র লীলা প্রকাশের জন্য ভাষার যে সক্ষমতার প্রয়োজন পড়ে, তার জোগান দিতে পারে কথ্য ভাষা। নিয়ত প্রবহমান এই ভাষারূপটি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে সাহিত্যের ভাষা স্বাগত জানাতে পারে কথ্যভাষাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,

যেটাকে লেখ্য ভাষা বলি সেটা কৃত্রিম, তাতে প্রাণপদার্থের অভাব, তার চলৎশক্তি আড়ষ্ট, সে বদ্ধ জলের মতো, সে ধারা জল নয়। তাতে কাজ চলে বটে কিন্তু সাহিত্য শুধু কাজ চলবার জন্যে নয়, তাতে মন আপনার বিচিত্র লীলার বাহন চায়। এই লীলাবৈচিত্র্য বাঁধা ভাষায় সম্ভব হয় না। এইজন্যেই কলকাতা অঞ্চলের চলতি ভাষাই সাহিত্যের আশ্রয় হয়ে উঠেচে। (ঠাকুর, ১৯৮৪: ২৩৫)

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যে কথ্যভাষার যথাযথ ব্যবহার ভাষার যে শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়, তা সাহিত্যের ভাষাকে ঋদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার মিল প্রত্যাশা করে বলেছেন–

ইউরোপের সকল দেশেই প্রদেশভেদে উপভাষা প্রচলিত আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে-সকল দেশে ভদ্রসাধারণের কথিত ভাষায় প্রভেদ নেই। এবং সেই ভদ্রসমাজের কথিত ভাষার সঙ্গে সে-সকল দেশের সাহিত্যের ভাষা মোটের উপর অভিন্ন। আমাদের দেশেও ভাষার মধ্যে যথাসম্ভব এইরকম মিল প্রার্থনীয়। বাংলা ভাষা স্বভাবতই দ্রুতবেগে এই মিলের দিকে চলেচে। (ঠাকুর, ১৯৮৪: ২৩৬)

ঋণকরণ সকল ভাষার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ধর্ম, ভূ-রাজনীতি, ŵবদেশিক বা বিভাষিক শাসন, ভাষার অনুপ্রবেশ, ভাষিক আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ন প্রভৃতি নানা কারণে ভাষাভাষীরা একদিকে যেমন অপরাপর ভাষার শব্দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে,

তেমনি একটি ভাষাও কৃতঋণ শব্দে সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যরচনা করতে মাতৃভাষায় উপযুক্ত শব্দ থাকলে, সেটিকে বাদ দিয়ে কোনো কৃতঋণ শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চূড়ান্তভাবে অসম্মত ছিলেন। সমকালীন মুসলিম লেখকের রচনায় রক্তের পরিবর্তে 'খুন' ব্যবহারের প্রবণতা তাঁকে বেশ ভাবিয়েছিল। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়:

> খুনখারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করে নি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ঐ অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ঐ অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। শক্তিমান মুসলমান লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্যব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশলাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে...। (ঠাকুর, ২০০০: ৪৫৯)

তবে তিনি একইসঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন যে, মুসলমান সমাজে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়, এমন শব্দরাজির স্বতস্ফূর্ত ব্যবহার ধীরে ধীরে ভাষার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্য কৃতঋণ শব্দের কদাচিৎ ব্যবহারে সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় বলে মনে করেন– "বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে দুটো ইরানী 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়" (ইসলাম, *রচনাবলী* (৭ম খণ্ড): ৩১)। ভাষা যেহেতু একটি সজীব সত্তা, তাই বিশেষ লেখক, রচনা বা রচনাশৈলীর উপস্থাপন সামগ্রিক ভাষাব্যবহারকে প্রভাবিত করতে পারে না। ভাষার শরীরে যেকোনো পরিবর্তন সংঘটিত হয় ধীরে ধীরে।

৩. বাক্যভাবনা

এক বা একাধিক পদ নিয়ে গঠিত হয় বাক্য। ভাষার প্রকাশরূপ চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে বাক্যের ওপর। আবার একটি অনুচ্ছেদে সবকটি বাক্য অভিন্ন ভাবের সূত্রে আবদ্ধ থাকে। সাহিত্যের ভাষার প্রকাশরূপ বিচারে বাক্যের পদক্রমের বিপর্যাস, সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের ব্যবহার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার, ক্রিয়া ও বিশেষণের বিশেষ ব্যবহার প্রভৃতির প্রকৃতি ও প্রবণতা লক্ষ করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় কীভাবে বাক্যিক প্রকৌশল নির্বাচিত ও রক্ষিত হয়েছে, তা যাচাই করে দেখা যাক:

বাক্যবিচারে পদক্রমবিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাভেদে বাক্যের পদক্রমে পার্থক্য থাকতে পারে। আবার একই ভাষার বর্ণনার ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষার পদক্রম রক্ষার প্রবণতা ভিন্ন হতে পারে। সাহিত্যের ভাষায় প্রায়ই প্রথাগত বা ব্যাকরণসম্মত

পদক্রমের রীতি থেকে সচেতনভাবে সরে আসা হয়। শৈলীবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে পদবিন্যাসের বিপর্যাস। একে বিচ্যুতিও বলা হয়। প্রবন্ধ ছাড়া সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় কমবেশি বিচ্যুতির উপস্থিতি থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় কবিতার ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কল্পনা* কাব্যের 'দুঃসময়' (ঠাকুর, ১৯৮৭: ১০৫) কবিতা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো :

	সাধারণ ক্রম		**বিপর্যস্ত ক্রম**
১.	**ক্রিয়াবিশেষণ + ক্রিয়া**	→	**ক্রিয়া + ক্রিয়াবিশেষণ**
	যদিও সন্ধ্যা মন্দ মন্থরে এসেছে		যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
২.	**অসমাপিকা ক্রিয়া + সমাপিকা ক্রিয়া**	→	**সমাপিকা ক্রিয়া + অসমাপিকা ক্রিয়া**
	ইঙ্গিতে সব **সংগীত** থেমে গেছে		সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
৩.	**বিশেষণ + বিশেষ্য**	→	**বিশেষণ + বিশেষ্য**
	এ কুন্দকুসুমরঞ্জিত কুঞ্জ নহে		এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
৪.	**কর্ম + ক্রিয়া**	→	**ক্রিয়া + কর্ম**
	মৌন মন্তরে মহা আশঙ্কা জপিছে		মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
৫.	**কর্তা + ক্রিয়া**	→	**ক্রিয়া + কর্তা**
	অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ঘুমায়!		ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে!

গদ্যের সঙ্গে কবিতার ভাষার একটি বড়ো পার্থক্য হলো কবিতার বোধের ন্যায় ভাষারূপটি কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং কখনো ভাষিক উপস্থাপন মুখ্য হয়ে ওঠে। সাধারণত বিশেষ ভাষিক প্রকৌশল প্রকাশে, কোনো শব্দে জোর দিতে কিংবা অন্ত্যমিল রক্ষায় পদক্রমের এ ধরনের বিপর্যাস ঘটানো হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তিটি স্মরণ করা যায়–

> ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছু-বা বলে, কিছু-বা গোপন করে; কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলটপালট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্টি হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৫)

গদ্যে বাক্যগঠনে রবীন্দ্রনাথ যে নানাবিধ নিরীক্ষা চালিয়েছেন, তার পেছনে কারণ হিসেবে প্রথমত সক্রিয় ছিল আত্মভাব উপস্থাপন এবং দ্বিতীয়ত পাঠকের অনুভবকে লেখকের অনুভবের সমান্তরাল করা। এ কারণেই কখনো ছোটো ছোটো বাক্যে পাঠককে গতিময়তায় ভাসিয়েছেন, আবার কখনো কোনো বিষয়ে ধাতস্থ হতে কিংবা

লেখকের উদ্দিষ্ট অনুভূতি কার্যকরভাবে অন্তঃকরণে পৌঁছে দিতে পাঠককে আটকে দিয়েছেন দীর্ঘ বাক্যের পাঠপরিক্রমায়। লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে দেখা যায়, যখনই তিনি মননশীল গদ্যে আবেগ যুক্ত করেছেন, তখনই বাক্য দীর্ঘ হয়েছে। এ সম্বন্ধে অরুণকুমার বসুর পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ :

> প্রথম যৌবনের গদ্যে রবীন্দ্রনাথ যুক্তির ভাষায় যখনই আবেগ সঞ্চার করতে চেয়েছেন, তখনই গদ্য বাক্য হয়ে উঠেছে বিন্যাসদীর্ঘ, বিশেষণ-সমৃদ্ধ জটিল ও যৌগিক বাক্যে ঘনীভূত এবং প্রচলিত পরিমাপের তুলনায় ঈষৎ দীর্ঘ। তাঁর প্রবন্ধের গদ্য বাক্যের এই আবেগঘণতার সংখ্যা থেকেই তাঁর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যুক্তিসম্পৃক্ত না আবেগতাড়িত, সে বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা বা সিদ্ধান্ত করা যায়। (অরুণকুমার বসু, দ্র. সুদক্ষিণা ঘোষ, ২০০৯: ভূমিকা)

সাহিত্যের ভাষায় বাক্য কেমন হবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোভঙ্গি বোঝার জন্য আলোচনার এ পর্যায়ে রবীন্দ্রগদ্যের কয়েকটি নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

১. মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, উপলক্ষের দ্বারা লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে; সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদি শিখিয়া বসে; ধনী হইতে চায়, টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া ওঠে; দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজোল্যুশন পাস করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। (রবীন্দ্র, ১৯৮৭: ৬২৯)

২. অতএব কবিত্ব রাখিয়া এই বাস্তব সত্যটার আলোচনা করা দরকার। (রবীন্দ্র, ১৯৮৭: ৬৩১)

৩. যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন– একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। (রবীন্দ্র, ১৯৮৮: ৫০২)

১নং দৃষ্টান্ত লক্ষ করলে দেখা যায় যৌগিক বাক্যের প্রকৌশলে মানুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্তরগত খেদ বৃহৎ বাক্যের পরিকাঠামোতে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। বাক্যটিতে প্রথম সেমিকোলনের পর সেমিকোলন দিয়ে বিযুক্ত প্রতিটি বাক্যাংশই একেকটি যৌগিক বাক্য। 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত ২ নং দৃষ্টান্তে 'কবিত্ব রাখিয়া' বাক্যাংশটি কিছুটা পরিহাসজ্ঞাপন করে পরক্ষণেই পাঠকের জিজ্ঞাসাকে আরেকটু উসকে দেয় প্রবন্ধকারের নতুন আলোচনার উদ্‌যোগ। একটিমাত্র সরল বাক্যে গঠিত অনুচ্ছেদ পাঠককে বিরতি না নিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে পরবর্তী অনুচ্ছেদে– নতুন আলোচনায়। ৩ নং দৃষ্টান্ত ৪২টি শব্দের একটি দীর্ঘ জটিল বাক্য। ড্যাশ চিহ্নের পূর্বে ও পরে দুটি বাক্য। অপ্রধান বাক্যগুলো নিসর্গের একেকটি ছবি এঁকে যখন হৃদয়ের গভীরের কোনো বেদনার সমান্তরাল হয়ে উঠলো বাক্যের একটি অংশ

তখন ড্যাশের যতিতে বাধা পড়েছে। ড্যাশের পরের অংশে গল্পের সরল ও অবুঝ বালিকাটির অব্যক্ত বেদনা পোস্টমাস্টারের কাছে বাক্যের প্রথম অংশের সমার্থক হয়ে উঠলো। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'আবেগের নিপুণ বিন্যাসে, ধ্বনিসাম্য ও ধ্বনি-বৈষম্যের সুকৌশল সংঘাতে, রূপচিত্রের বৈচিত্র্যে, প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাসের ধ্বনিব্যঞ্জনায়, ভঙ্গি-অন্বয়-শব্দক্রীড়া-যতি ও ছেদের কুশলী সজ্জায় রবীন্দ্রনাথ গল্পভাষায় সঞ্চার করেন কবিতার সুর-তাল-লাবণ্য' (ঘোষ, ২০২০: ১৫৮)।

বাক্যতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য যতিচিহ্ন। কারণ যতিচিহ্নের যথার্থ প্রয়োগ বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার পাশাপাশি বিভ্রান্তি রোধ করে। সাহিত্যের ভাষার লিখিত রূপে যতিচিহ্নের প্রয়োগ ভাব পরিজ্ঞাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘদিন সকল যতিচিহ্নের সুচারু ব্যবহার করলেও, জীবনের শেষভাগে যতিচিহ্নের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। 'চিহ্নবিভ্রাট' প্রবন্ধে যতি বা ছেদচিহ্ন সম্বন্ধে তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন :

> যতি-সংকেতে পূর্বে ছিল দণ্ডহাতে একাধিপত্য-গর্বিত সিধে দাঁড়ি–কখনো-বা একলা কখনো দোকলা। যেন শিবের তপোবনদ্বারে নন্দীর তর্জনী। এখন তার সঙ্গে জুটে গেছে বাঁকা বাঁকা ক্ষুদে ক্ষুদে অনুচর। কুকুরবিহীন সংকুচিত লেজের মতো। যখন ছিল না তখন পাঠকের আন্দাজ ছিল পাকা, বাক্যপথে কোথায় কোথায় বাঁক তা সহজেই বুঝে নিত। এখন কুঁড়েমির তাগিদে বুঝেও বোঝে না। সংস্কৃত নাটকে দেখেছ রাজার আগে আগে প্রতিহারী চলে–চিরাভ্যস্ত অন্তঃপুরের পথেও ক্ষণে ক্ষণে হেঁকে ওঠে, 'এই দিকে' 'এই দিকে'। কমা সেমিকোলনগুলো অনেকটা তাই। (ঠাকুর, ২০০০: ৪৪৭)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, যখন যতিচিহ্ন হিসেবে কেবল দাঁড়ি ও কমা ছিল, তখনও পাঠকরা ঠিকই বিরতি বুঝে রচনা পড়তে পারতেন। বহু যতির প্রচলন পাঠকদের অলস করেছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি দুই ধরনের যতি ছাড়া বাকিগুলোর প্রয়োজনীয়তা নেই বলে বিশ্বাস করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্বের লেখার নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে গেলেন, তখন যতিচিহ্ন প্রয়োগে মিতব্যয়ী হলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষ্যে:

> একদিন চিহ্নপ্রয়োগে মিতব্যয়ের বুদ্ধি যখন আমাকে পেয়ে বসেছিল তখনই আমার কাব্যের পুনঃসংস্করণকালে বিস্ময়সংকেত ও প্রশ্নসংকেত লোপ করতে বসেছিলুম। প্রৌঢ় যতিচিহ্ন সেমিকোলনকে জবাব দিতে কুণ্ঠিত হই নি। কিশোর কমা-কে ক্ষমা করেছিলুম, কারণ, নেহাত খিড়কির দরজায় দাঁড়ির জমাদারী মানানসই হয় না। লেখায় দুই জাতের যতিই যথেষ্ট, একটা বড়ো একটা ছোটো। সূক্ষ্ম বিচার করে আরো-একটা যদি আনো তা হলে অতি সূক্ষ্ম বিচার করে ভাগ আরো অনেক বাড়বে না কেন। (ঠাকুর, ২০০০: ৪৪৭)

যেহেতু সাহিত্যের ভাষা মানবীয় ভাষারই একটি বিশেষ প্রকাশরূপ, তাই তার সর্বোত্তম ব্যবহারে যতিচিহ্নের প্রয়োগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

৪. উপমা ও চিত্রকল্প

The chief ways of communicating sense indirectly are through imagery, figurative language, and symbols (Glathorn, 1971: 270)। সাহিত্যের ভাষায় উপযুক্ত উপমা, চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার একদিকে পাঠকের মনকে সহজে লেখকের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে সৌন্দর্যের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে। উপমা ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে কালিদাস অবিস্মরণীয় নাম। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর উপমাসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে সার্থকতার প্রমাণ রেখেছেন। কবিতা, কথাসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য ও চিঠিপত্র এবং মননশীল গদ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপমা ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়'– এই উদ্ধৃতাংশটি উল্লেখ করে 'সাহিত্যের তাৎপর্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাইরের জিনিস ক'রে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল যখন, কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে, দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়। আগ্রহ যে পাখির মতন ধায় এটা মনের সৃষ্ট ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়' (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮৫)। বিজ্ঞান ও যুক্তির বিচারে এই ভাষার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু কবির মনোলোকে যে বোধের জাগরণ হয়েছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভাষায় প্রকাশ করলে তা বিজ্ঞান, যুক্তি বা বিবরণের ভাষা থেকে আলাদা হবে। মানুষের মন বহির্জগতের যে বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, তার অনুলিপি গ্রহণ করে না, তাকে মনের মতো করে গ্রহণ করে। তাই বস্তুবিশ্ব ও মননবিশ্বের মধ্যে পার্থক্য হয়। বহির্জগতের কোনো উদ্দীপনা, প্রতিবেশ মনকে অভিভূত করে, মনের মধ্যে তখন নতুন চিত্রময়তা সৃষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে ধারণা দিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রিক কবির একটি শ্লোকের যে অনুবাদ করেছেন, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

> আপেল গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝুরুঝুরু বইছে শরতের হাওয়া; থরথর ক'রে কেঁপে-ওঠা পাতার মধ্যে থেকে ঘুম আসছে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে– ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো। এই-যে কম্পমান ডালপালার মধ্যে মর্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশব্দ নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি, এ আমাদের মনের রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন ক'রে তুলে তবেই পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি। (ঠাকুর, ১৯৮৯, দ্বাদশ খণ্ড: ৪৮৫)

৫. উপসংহার

ভাষা মানুষের চিন্তার প্রকাশ, তবে সুনিশ্চিতভাবে দর্পণ হওয়া ভাষার পক্ষে আদৌ সম্ভব কি-না– এ নিয়ে বিতর্ক আছে। মনোলোকে জেগে-ওঠা নানাবিধ প্রতিক্রিয়াকে মানুষ ভাষার সাহায্যে প্রকাশের উদ্যোগ নেয় ঠিকই, কিন্তু তার সমগ্র অনুভূতির অনুপুঙ্খ

প্রকাশ কতখানি সম্ভবপর হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি ভাষার যে 'গভীরতর গঠন' (deep structure)-এর কথা বলেছেন, তার তল প্রকাশ ব্যক্তির নিজের জন্যই দুষ্কর্ম, দ্বিতীয় কারো পক্ষে তার শতভাগ অনুধাবন দুরূহতম। তাই ব্যক্তির মনোজগতের কানাগলির খবর, নানামাত্রিক জিজ্ঞাসা ও অনুভূতির স্বরলিপি অপরাপর ব্যক্তির মনোলোকে প্রবিষ্ট করিয়ে অনুভবযোগ্য করে তোলার জন্য বক্তা বা লেখকের বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয়। যুগযুগ ধরে সাহিত্যিকগণ ভাষাকে আশ্রয় করে যে কথা বলে গেছেন, তা যুগান্তরেও মানুষের মনকে সুন্দরের আভায় উদ্ভাসিত করে। সাহিত্যিকের ভাষা পাঠকের মনে নতুন জগতের সৃষ্টি করে। আর এভাবেই সাহিত্য-সাহিত্যিক উভয়েই মহাকালের যাত্রায় টিকে থাকেন মহিমান্বিত হয়ে।

সহায়কপঞ্জি

খাতুন, সন্‌জীদা, ২০০৯। *ধ্বনি থেকে কবিতা*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ২০২০। *অশেষ রবীন্দ্রনাথ*। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ

ঘোষ, সুদক্ষিণা, ২০০৯। *রবীন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্যের নির্মাণশিল্প*। কোলকাতা: ভাষা ও সাহিত্য

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, ১৯৯৭। 'ধ্বনি-বিচার' [প্রথম প্রকাশ: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩১৪), ১৪: ২]। আজাদ, হুমায়ুন (*সম্পাদিত*) *বাঙলা ভাষা*। ঢাকা: আগামী

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৭। *রবীন্দ্র রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড (সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কোলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৮। *রবীন্দ্র রচনাবলী* অষ্টম খণ্ড (সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কোলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৪। *বাংলা শব্দতত্ত্ব*। বিশ্বভারতী, কলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯। *রবীন্দ্র রচনাবলী* দশম খণ্ড (সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কোলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯। *রবীন্দ্র রচনাবলী* একাদশ খণ্ড (সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কোলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯। *রবীন্দ্র রচনাবলী* দ্বাদশ খণ্ড (সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কোলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯। *রবীন্দ্র রচনাবলী* ত্রয়োদশ খণ্ড (সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কোলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯। *রবীন্দ্র রচনাবলী* চতুর্দশ খণ্ড (সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কোলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২০০০। *রবীন্দ্র রচনাবলী* ষোড়শ খণ্ড (সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কোলকাতা

শ', রামেশ্বর, ১৯৯৬। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। পুস্তক বিপণি, কোলকাতা

Glathorn, Allan A. et al., 1971. *The Dynamics of Language*. Heath, Sutton

Hockett, Charles F., 1968. *A course in Modern Linguistics*. The Macmillan Company, New York

Pei, Mario, 1957. *The Story of Language.* Lippincott, Philadelphia

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-2-definitions.html

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (Article 2 – Definitions). Retreived on July 9, 2021, from https://www.un.org/

development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-2-definitions.html